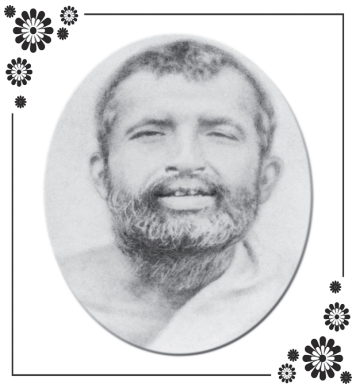

অবতারবরিষ্ঠায়

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

‘অবতারবরিষ্ঠ’ শব্দটি ব্যবহার করে স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের এক অনবদ্য প্রণামমন্ত্র রচনা করে গেছেন। ‘অবতারবরিষ্ঠ’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অবতার। এই শ্রেষ্ঠত্বের আবার দুরকম অর্থ হতে পারে। এ-তাবৎ যত অবতার এসেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অথবা এই অবতরণ এক চিরন্তন শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। ঈশ্বর যুগে যুগে অবতার হয়ে আসেন—এটি ঈশ্বরের মুখের কথা, শাস্ত্রীয় সত্য। ঈশ্বরের ওপর শ্রেয়, শ্রেয়তর বা শ্রেষ্ঠ বিশেষণ প্রয়োগ করা চলে না, কিন্তু তাঁর শক্তি প্রকাশের ওপর করা চলে এবং যুগপ্রয়োজনে তাঁর শক্তির প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, ‘‘শক্তিরই অবতার।’’ মানুষ থেকে অবতার পর্যন্ত এই শক্তিরই প্রকাশভেদ। এ-পর্যন্ত বিভিন্ন অবতারের পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে, তাঁদের প্রচারিত ভাবের ভিত্তিতে। কিন্তু সর্বভাব-সমন্বিত শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকই আসতেন; শুধু আসতেন না, তাঁকে তাঁদের নিজের সম্প্রদায়ের একজন সিদ্ধ পুরুষ বলে মনে করতেন। স্বামী বিরজানন্দজী ‘সিদ্ধসর্বসম্প্রদায়-সম্প্রদায়বর্জিতম্’ বলে তাঁকে স্তুতি করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর নামাঙ্কিত একটি সঙ্ঘ স্থাপন করলেও তাকে অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এই সঙ্ঘে সম্প্রদায়ের কূপমণ্ডূকতাজাত সংকীর্ণতা—যা অপর সম্প্রদায় অপেক্ষা ব্যক্ত বা গুপ্তভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করে—তা থাকবে না, অথচ সম্প্রদায়গত সঙ্ঘের কার্যকরী গুণগুলি থাকবে। কিন্তু এই ‘অবতারবরিষ্ঠ’ শব্দটি অন্যান্য সম্প্রদায়ের চোখে গুপ্তভাবে নিজেদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা বলে গৃহীত হওয়ার আশঙ্কা। অথচ স্বামীজী শব্দটি সচেতনভাবেই ব্যবহার করেছেন। তাই এই শব্দটি ব্যবহারের যৌক্তিকতা খোঁজার একটু চেষ্টা করা যেতে পারে।

কিন্তু অবতারের শক্তির পরিমাপ করা অসম্ভব, তাই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বিচারই বা করা যায় কী করে? শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, অবতার অচিনে গাছ, তাঁকে চিনতে পারা যায় না। তবে গাছটিকে চিনতে না পারলেও তার ফল দেখে, এবং সে-ফলের কার্যকারিতা দেখে সে-গাছের মহিমার কিছু আন্দাজ করা যায় বই কী! আমাদের বিচারের পথ তাই এই সূত্রটি অবলম্বন করেই। তাঁর সামগ্রিক শক্তির পরিমাণ বিচার নয়, যে-যুগে তাঁর অবতরণ সে-

যুগের সামাজিক অবক্ষয়ের সঙ্গে অপরাপর যুগের অবক্ষয়ের একটা তুলনামূলক পরিমাপের চেষ্টা করা যেতে পারে; তারপর সমাজে বহুকালার্জিত অবক্ষয়ের সেই অচলায়তন ঘুচিয়ে এক স্থায়ী উত্তরণের পথে তুলে দেওয়ায় অবতারের যে-শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটেছিল সেটিই তাঁর মহিমার গভীরতা বুঝতে অনেকটা সাহায্য করবে। সর্বোপরি তাঁর অবতারপ্রতিম পার্ষদ ও সিদ্ধ সাধকদের মূল্যায়নও এ-ব্যাপারে আমাদের পথপ্রদর্শক।

বরাহ অবতারে হিরণ্যাক্ষ বধ, নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ, বামন অবতারে বলিরাজার মাথায় চরণ স্থাপন করে তাকে পাতালে প্রেরণ ভিন্ন পৌরাণিক অবতরণগুলির অন্যতর প্রকাশ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। শ্রীরামচন্দ্রে আমরা প্রথম একটি অনুসরণীয় জীবন ও সে-জীবনে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ দেখতে পাই। তাঁর চরিত্র, তাঁর জীবনচর্যার তুলনায় রাবণবধের বিস্তারিত কাহিনি কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তাঁর অতুলনীয় চরিত্রের একটি পূর্ণ চিত্র সংক্ষেপে এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ, যা বোধহয় তাঁর পক্ষেই সম্ভব। বাল্মীকি আর নারদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তিনি বলছেন ('ভাষা ও ছন্দ'),

''ভগবন্, ত্রিভুবন তোমাদের প্রত্যক্ষে বিরাজে—
কহ মোরে কার নাম অমর বীণার ছন্দে বাজে।
কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয় নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে
একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজশিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহ মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যায় রঘুপতি রাম।' ''

শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে এক বিরল বৈপরীত্যের সমন্বয়। এ-প্রসঙ্গে স্বামী বিশ্ববেদানন্দজীর একটি চিঠির কথা মনে পড়ছে। শ্রীমায়ের সন্তান স্বামী আদিনাথানন্দজীর কাছে শোনা প্রসঙ্গের উল্লেখ করে তিনি লিখছেন, তখনকার কলেজের ছাত্ররা অনেকেই বলরাম মন্দিরে হরি মহারাজের কাছে যেতেন ও তিনি স্বামীজীর প্রসঙ্গ করতে করতে মেতে যেতেন। একদিন একজন তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসঙ্গ করতে বললে তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, ''First know the perfect man, then try to know the superman. কত বিচিত্র ও বিরুদ্ধ গুণের একত্র সমাবেশ হলে তবে একজন পূর্ণ মানব হয়ে ওঠে তা আগে বোঝার চেষ্টা করো, তারপর তো সেই দেবমানবকে বুঝবে।''

অন্ধমুনির শাপে বর হয়ে রাজা দশরথের ঘরে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম। তবে সেই যুগপ্রয়োজনটি সঠিক ধরা যায় না—মুনিঋষিদের যজ্ঞ পণ্ডকারী কিছু অসুর, দানব-বিনাশ ছাড়া। কিন্তু পরবর্তী রাজকুলের জন্য শ্রীরামচন্দ্র এক অতুলনীয় অনুকরণযোগ্য চরিত্র রেখে গেছেন। শুধু রাজকুল কেন, সাধারণ মানুষও তাঁর অনুসরণে রাজকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ে। সিংহাসনে আরোহণের মুহূর্তে তাঁর পিতৃসত্য পালনের জন্য নির্দ্বিধায়, বিনা ক্ষোভে চীরবাস পরিধান করে চোদ্দো বছরের জন্য বনবাস গ্রহণ। স্ত্রী-অপহরণকারী অহংকারের মূর্তি রাবণকে পরম ক্ষাত্রবীর্য প্রকাশ করে তার সপরিবার ধ্বংসসাধন। আবার এত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ফিরে পাওয়া প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে পরিত্যাগ। সত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিনিয়ত নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের বলিদান রামচন্দ্রের চরিত্রকে এক অনন্য মর্যাদা দান করেছে, যার অনুসরণ করতে আজও মানুষ প্রেরণা পায়। এযুগে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এর এক অনন্য উদাহরণ। সেই সত্যপ্রীতি, যার ফলে নিজের সাজানো সংসার অবলীলায় ফেলে

অনিশ্চয়তার জীবন গ্রহণ। সেই চরিত্র, যার কল্যাণে আর্থিক দারিদ্র্য সত্ত্বেও সমাজে তাঁর রাজকীয় প্রতিষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভয়সংকুল কংসের কারাগারে ক্ষত্রিয়গর্ভে, কিন্তু অবস্থা বিপর্যয়ে তিনি মানুষ হলেন গোপনন্দন হিসাবে গোপবালকদের মধ্যে। নিজেই বলেছেন (গীতা ৪।৯),

''জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥''

সত্যই তাঁর দিব্য জন্মকর্ম অনুধ্যান করলে তাঁকেই হৃদয়ে ধারণ করা হয়, আর জন্মাতে হয় না। শৈশবেই তাঁর মধ্যে ঈশ্বরীয় শক্তির মুহুর্মুহু বিচ্ছুরণ। কংসপ্রেরিত একের পর এক অসুর ও রাক্ষসের শিশু কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু। কিন্তু অবতার আসেন যুগপ্রয়োজনে, কয়েকটি দানব বিনাশের জন্য নয়। সেযুগের অবক্ষয়ের বর্ণনা নিজেই দিয়েছেন শ্রীভগবান (গীতা ২।৪২) :

''যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥''

চিরকাল সমাজের মুখ্য কিছু মানুষই ধর্মকার্য পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু সেই সময় যাঁরা তা করছেন তাঁরা তাঁদের অবিবেকী বুদ্ধির কারণে বেদের কর্মকাণ্ডই একমাত্র অবলম্বনীয় বলে সে-সম্পর্কে আপাতমনোহর বাক্য বলে বেড়াচ্ছেন। সগর্বে এও বলছেন যে এছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্বই নেই। তাঁরা 'কামাকুলিত'-চিত্ত, স্বর্গই একমাত্র পুরুষার্থ এই ভাবনাতে বিশ্বাসী, ভোগ ও ঐশ্বর্যের প্রতি প্রবল আসক্ত এবং তা সংগ্রহে 'ক্রিয়াবিশেষবহুল' সাধনে মত্ত। কিন্তু এটি যে জন্ম-কর্ম, সুখ-দুঃখের চক্রে আক্রান্ত তা মোহগ্রস্ত বুদ্ধিতে ধারণা হয় না। মৃত্যুপূর্ণ এ-সংসারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার ইচ্ছা বা ভাবনা কোনওটাই তাঁদের নেই। বর্ণবিভাগে ভেদ প্রকট হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, গুণ ও কর্মবিভাগের দ্বারা তিনিই এই চারটি বর্ণের স্রষ্টা। সমাজদেহে একটি বর্ণ গুরুত্ব পেয়ে অপরগুলি অবহেলিত হলে মানবদেহের অঙ্গের মতো সমগ্র সমাজদেহটিই বিকল হয়ে পড়ে। তাই তিনি নিজে আচরণ করে দেখালেন। যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করছেন, শ্রীকৃষ্ণ এলেন, পাণ্ডবদের আনন্দের সীমা নেই। তাঁর পরামর্শে যুধিষ্ঠির কৌরব ভাইদের যজ্ঞের নানা অঙ্গের ভার দিলেন আর শ্রীকৃষ্ণ নিজে সমস্ত অতিথি-অভ্যাগতদের পদ প্রক্ষালনের ভার নিলেন, যা ছিল শূদ্রের কর্ম। বললেন, নিজ নিজ কর্মে নিষ্ঠা থাকলে তার দ্বারাই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে—''স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।'' মানুষ তার প্রকৃতিজাত কর্মপ্রবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভ করতে পারে—''স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ।'' বৃন্দাবনে তাঁকে ঘিরে ভক্তিপথের বিভিন্ন ভাবের যে-লীলা হয়েছিল তা আজও জগতের সম্পদ। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নয়, উপনয়নহীন, শাস্ত্রজ্ঞানহীন গোপসমাজে বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর ভাবের যে-পরাকাষ্ঠা জগৎ দেখেছিল তা তাঁর যুগাবতারত্বের যাথার্থ্যই প্রদর্শন করে। হস্তিনাপুরে বিদুর ও ভীষ্ম তাঁর ঈশ্বরত্ব অবহিত ছিলেন। যিনি শিশুকালে কালিন্দীর দহে বিষোদ্গারক কালীয় নাগের ফণার ওপর নৃত্য করে তাকে মুমূর্ষু করে তুলেছিলেন, তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধ স্নেহের কালিন্দীতে শঠ, কপট, ক্রূর দুর্যোধনের মদমত্ত অহংকারের ফণার ঔদ্ধত্য বশীভূত করতে পারতেন তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তা তিনি করেননি। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে মানবিক পথেই চালিয়েছিল। অলৌকিক শক্তিবলে বিনা আয়াসে সমাজ কিছু পেলে তা ধারণ করে রাখতে পারে না, অধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ক্ষাত্র প্রয়াসে ভাঁটা পড়ে। যুদ্ধ রুখতে নিজের দৌত্য কর্ম যখন দুর্যোধন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হল তখন অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তুত

করলেন যুদ্ধের জন্য। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রারম্ভে অর্জুনের বিষাদ ও মোহ দূর করবার উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত গীতা আজ বিশ্বের ধর্মজগতে কালজয়ী স্থান করে নিয়েছে। তাঁর প্রতিটি কর্মেই এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততা অথচ দূরদর্শিতা দেখা যেত। জরাসন্ধের পুনঃ পুনঃ মথুরা আক্রমণ ঠেকাতে তিনি রাজ্য মথুরা থেকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন। উদ্দেশ্য অযথা লোকক্ষয় পরিহার। তার জন্য তাঁর 'রণছোড়জী' নাম নিতেও আপত্তি হয়নি। জরাসন্ধকে ভীম কর্তৃক হত্যা করিয়ে অবরুদ্ধ সমস্ত রাজাদের মুক্তি দিয়ে তাঁদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। তাঁর মধ্যে মানুষ এক প্রেমিক অথচ বীর্যশালী, পরাক্রমী, আনন্দদায়ী, বিচক্ষণ এবং নিরন্তর পরার্থে কর্মনিরত পুরুষকে দেখতে পেত।

শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন এক চরম অবক্ষয়ের যুগে। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, পূর্ব পূর্ব অবক্ষয়গুলি এইবারের অবক্ষয়ের তুলনায় গোষ্পদতুল্য। যুগপ্রয়োজন নামক অধ্যায়টিতে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন লীলাপ্রসঙ্গকার। এবারের অবক্ষয় শুধু কামকাঞ্চনাসক্তিজাত ছিল না। ধর্মের উদ্দেশ্যই মানুষের বোধ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এ শুধু হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেই নয়, জগতের সমস্ত মুখ্য ধর্মের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ছিল। ঈশা ও মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেই সেই ধর্মের মাধ্যমে এক ধর্মীয় জাতীয়তা তৈরি করা এবং তার সুযোগে অপরের ওপর প্রভুত্ব করা। হিন্দু ধর্মের উদারতা—যা প্রতিটি মানুষকে তার নিজস্ব ভাবে ধর্মাচরণ ও আধ্যাত্মিক পথে এগোবার সুযোগ দিয়েছিল—তা অপব্যবহৃত হয়ে নিজের পথটি ঠিক ও অপরেরটি ভুল এই বিশ্বাসে সমাজকে দ্বন্দ্ব ও ভেদবুদ্ধির চরম ক্ষেত্র করে তুলেছিল। প্রত্যেক মানুষের মাঝেই ঈশ্বরের অবস্থিতিতে বিশ্বাস ও তার বিকাশ সাধনই যে ধর্ম, বেদান্ত প্রদর্শিত এই বোধ ধর্মীয় আচরণ থেকে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। সত্য কী তা জানার প্রয়োজনহীন সমাজ সত্যান্বেষীদের কাছে এক বিভ্রম, এক দিশাহীন অন্ধকার বলে পরিগণিত হত। বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত—যাঁর দয়া সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, ''এ সত্ত্বের রজঃ''—তিনিও বলতেন, ''আমার মনে হয় শাস্ত্র যা বোঝাতে গেছে তা বোঝাতে পারেনি।'' অর্থাৎ এটি একটি গোলকধাঁধাঁ বলে বোধ হয়েছে এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও মানুষকে সন্দিহান করে তুলেছে। সর্বোপরি সেই সময়ে ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে এসেছে পাশ্চাত্যের চাকচিক্যময় জড় সভ্যতা, এবং এই শতধা বিভক্ত হিন্দু ধর্ম যে কোনও ধর্মই নয়, তা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে খ্রিস্টীয় যাজককুল বদ্ধপরিকর। শুধু ধর্মের দিক দিয়ে নয়, সর্ববিষয়ে চরম নৈরাজ্য চারিদিকে। শাস্ত্রপাঠের উদ্দেশ্য শুধু পাণ্ডিত্য অর্জন করে নাম, যশ ও অর্থ উপার্জন। তার তত্ত্বকে জীবনে প্রতিফলিত করাই যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য সে-সম্বন্ধে জ্ঞান বা ধারণা কোনওটাই নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন তাই শাস্ত্রবিদ্যাবিহীন। বললেন—ওটি চালকলা বাঁধা বিদ্যা, প্রয়োজন সেই বিদ্যার যা অবিদ্যা দূর করে। প্রথাগত শাস্ত্রীয় সাধনপথ অনুসরণ না করে শুধুমাত্র ব্যাকুলতা সহায়ে জগন্মাতার দর্শন লাভের যে-প্রচেষ্টা তিনি শুরু করলেন তা আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অশ্রুতপূর্ব। শ্রীরামচন্দ্রের বা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরসাধনার ইতিহাস তেমন কিছু পাওয়া যায় না। তাঁদের জীবনকথার রচয়িতারা প্রথম থেকেই তাঁদের উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ করে তাঁদের জীবনে ঈশ্বরসাধনার অবকাশ বিশেষ রাখেননি। অবতারের জীবন সদাই দৃষ্টান্তমূলক। তাঁদের আদর্শ জীবনে অনুসরণ করতে যে-সংগ্রাম দরকার, যে-প্রবল সাধন দরকার তা তাঁদের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত হিসাবে পাওয়া মুশকিল। গীতাতে সাধনের বিভিন্ন পথের আলোচনা আছে; ত্যাগ, বৈরাগ্য, অনাসক্তি

অর্জনের উপদেশ আছে; নিরন্তর অফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্মের কথা আছে, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে সে-আদর্শে উত্তরণের দৃষ্টান্তমূলক প্রচেষ্টার কোনও উল্লেখ নেই। সেগুলি যেন স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উপস্থিত। পরবর্তী অবতার সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভের কঠোর সাধনার ইতিহাস আছে। কিন্তু তা শূন্যবাদ ও ঈশ্বরবিহীন হওয়ায় এ-দেবদেবীর মাটিতে তার শিকড় দৃঢ় হতে পারেনি, যদিও তাঁর অপার করুণাপূর্ণ হৃদয়ের বিকাশ এদেশের মাটিকে উজ্জীবিত করেছিল। তখনও পর্যন্ত ভারতকে কোনও আগ্রাসী ধর্মের মোকাবিলা করতে হয়নি। নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে নির্বিচারে সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার দেওয়ায় তা ক্রমশ সন্ন্যাস আশ্রমকেই কলুষিত করে ফেলে, যার ফলশ্রুতি শংকরাচার্যের আবির্ভাব। শংকরাচার্য সন্ন্যাস আশ্রমকে অদ্বৈত বেদান্তের সঙ্গে যুক্ত করে তার অধিকারীর লক্ষণ স্থির করে দিলেন, আর সেই সঙ্গে স্থির করে দিলেন গৃহস্থের ধর্মীয় আচরণ। কিন্তু কয়েক শতক পরে আবার ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থান ও অবশিষ্ট জনসমাজে নিম্ন, ব্রাত্য ইত্যাদি বর্গের উদ্ভব হয়ে তাদের ধর্মাচরণের অধিকার সংকুচিত ও সামাজিক ভাবেও নিপীড়ন হতে লাগল। ফলস্বরূপ তারা দলে দলে মুসলমান ধর্মে যোগ দিতে লাগল। তখন ভারতে পাঠান যুগ। এলেন চৈতন্যদেব তাঁর ঈশ্বরে নিমজ্জিত সত্তা নিয়ে। তিনি নিজে শংকরাচার্য প্রবর্তিত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে আচণ্ডালে কৃষ্ণনাম বিলাতে লাগলেন। সে-নামে মাতোয়ারা হয়ে এক নতুন অভ্যুদয় এল সমাজে। যুগোপযোগী একটি ভাব, একটি সাধনার ধারা পেয়ে, ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হয়ে ধন্য হল সমাজ।

কিন্তু যখনই কোনও যুগোপযোগী ধর্মীয় উত্তরণের ভাব সমাজে প্রচারিত হয়েছে তা সকলের জন্যই প্রযুক্ত হয়েছে, যা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ মানবজগতের ভাবনার বিচিত্রতার বিরোধী। সে-বিষয়ে অবতার-পরবর্তী ভাবপ্রচারকদের ক্রমসংকীর্ণ মনোভাব সে-ভাবের অবলুপ্তি ত্বরান্বিত করেছে মাত্র। শ্রীরামকৃষ্ণ এ-ব্যাপারে দৈবনির্দিষ্ট, যিনি মানুষের ভাবের, ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্য মেনে নিয়েই তাঁর সাধনা শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর সাধনজীবনের প্রথমে দৈবনির্দেশে, অথবা হয়তো অন্তরে সজ্ঞানে সমস্ত ধর্মীয় আচার, মত ও পথের বাইরে শুধুমাত্র তীব্র ব্যাকুলতা সহায়ে জগন্মাতার দর্শন লাভ করলেন, যা অসংখ্য মত ও পথের বিভিন্নতা-নিরপেক্ষ এক সাধারণ সূত্রের আবিষ্কার। আর এই নিরপেক্ষতা প্রদর্শনের জন্যই হয়তো তাঁর প্রথম জগন্মাতার দর্শন এক জ্যোতিঃসমুদ্ররূপে। তিনি বলতেন, লাউ-কুমড়োর আগে ফল তারপর ফুল—যা তাঁর নিজের জীবনের উপমা। তাই দেখি জগন্মাতার দর্শন লাভ করে তিনি মায়ের কাছে শিশুর মতো আবদার করছেন—আমায় শাস্ত্রের মর্ম বুঝিয়ে দাও, আর সব মত ও পথের মানুষ তোমায় কেমন করে ডাকে ও দর্শন পায় তা আমায় দেখিয়ে দাও। এক অভূতপূর্ব সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন তিনি। হিন্দুর তন্ত্রের চৌষট্টিটি শাখা, বৈষ্ণবের পঞ্চভাব, খ্রিস্টান মত, ইসলাম ইত্যাদি অসংখ্য ভাবের সাধনায় সিদ্ধ হলেন। প্রথমেই সাকার, নিরাকারের উপলব্ধি হয়ে যাওয়ার ফলে তাঁর কোনও ভাবেই সিদ্ধ হতে তিনদিনের বেশি সময় লাগেনি। ভাবসিদ্ধির চরমে ইষ্টের অবলুপ্তি ঘটত তাঁর শরীরে। প্রতিটি ঈশ্বরীয় রূপ যে স্বরূপত অভিন্ন, 'একং সদ্, বিপ্রা বহুধা বদন্তি' এই মহান তত্ত্বের শিক্ষা বুদ্ধি দিয়ে নয়—পরন্তু বিভিন্ন সাধনার অনুভবে তাঁর জীবনে অনুভূত ও পরীক্ষিত হয়ে জগতে ঘোষিত হল।

আর একটি কার্য সমাধা হল এর দ্বারা। বিভিন্ন ভাব ও ধর্মগুলি—যা কালের প্রভাবে উদ্দেশ্যহীন আচার-আচরণে নিবদ্ধ হয়ে তাদের লক্ষ্যপথের মুখটি অবরুদ্ধ করে ফেলেছিল—তা আবার তাঁর

সাধনশক্তিবলে উন্মুক্ত হয়ে গেল। এছাড়া তাঁর প্রতিটি ভাব ও ধর্মসাধনের কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। দু-একটি সাধনের পর উপরিউক্ত সিদ্ধান্তে আসাই ছিল স্বাভাবিক। তিনি নিজমুখে বলেছেন, ''এখানে সব রকমের ভাব আছে, তাই সব মত ও পথের লোকেরা এখানে আসে।'' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়, সবাই এসে তার নিজের ভাবের পরিপুষ্টি লাভ করে, অন্য কোনও ভাবের আশ্রয় নিতে হয় না। শ্রীমা বলছেন, ''আগের সবাই যে যার নিজের ভাবকেই বড় করে গেছে।'' শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব সর্বগ্রাসী, সবারই ঠাঁই সেখানে, তিনি চান শুধু নিজের নিজের ভাবে আন্তরিক নিষ্ঠা। তাই যখন কারও সম্বন্ধে বলেন ''ও এখানকার লোক নয়,'' তার অর্থ সে-ব্যক্তি তার সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ বিসর্জন দিয়ে সমস্ত মত ও পথের যাথার্থ্য স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই স্বামীজী বলতেন যে প্রতিটি মানুষের জন্য আলাদা ধর্ম থাকলে তিনি খুশি হতেন। ভাবটি হল, এ-বৈচিত্র্য যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই বিচিত্র ও বিভিন্ন পথের মাধ্যমে তাঁকে পাওয়ার পথও সৃষ্টি করেছেন; চাই শুধু নিজের নিজের পথে বিশ্বাস ও তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

যে-কোনও নতুন ভাব নির্মাণ ও প্রচার প্রবল শক্তির পরিচায়ক; আর সমস্ত মত ও পথের সাধন ও সিদ্ধি, এবং সে-সমস্ত মত ও পথকে সমন্বিত করে সমগ্র জগতের ধর্মীয় ভাবনাগুলিকে এক নবজীবন দান যে এক অতুল শক্তির পরিচয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই অত্যদ্ভুত কর্মের নির্মাণ ও ভাবজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে তার বিশ্বময় প্রচার এক শরীরে সম্ভব নয় বলেই ঈশ্বরকে আর এক ঈশ্বরপ্রতিম ব্যক্তিকে ধরাধামে আনতে হয়েছিল। এঁদের পারস্পরিক মূল্যায়নের সূত্র ধরেই আমাদের তাঁদের কর্মের ও শক্তিপ্রকাশের গভীরতার অনুমান করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন, যে-শক্তিতে কেশবচন্দ্র সেন জগদ্‌বিখ্যাত হয়েছেন সেইরকম আঠারোটা শক্তি পূর্ণমাত্রায় নরেন্দ্রের মধ্যে বর্তমান। এ-শক্তির পরিমাণ আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও মুশকিল, কিন্তু যখন দেখি এক পরাধীন দেশের প্রতিনিধি হয়ে পাশ্চাত্যে গিয়ে তাদের ভাবজগতে আলোড়ন তুলে চিন্তাবিদদের চিন্তায় পরিবর্তন আনছেন স্বামীজী, তখন তাঁর শক্তির আভাস আমরা পেতে থাকি। আবার তিনিই যখন তাঁর গুরুভাইদের লেখেন ''শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের বাবা'' অথবা ''তাঁর কৃপায় লাখো বিবেকানন্দ তৈরি হতে পারে'', তখন আবার শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তির অসীমত্বের কতক আন্দাজ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালেই তাঁর শক্তির অনুমান করে বিভিন্ন সাধক তাঁদের নিজেদের আধ্যাত্মিক স্তর থেকে তাঁর মূল্যায়ন করেছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে 'নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব' বলতেন, সাধক ও বৈষ্ণবতন্ত্রে সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ 'অবতার' বলে স্তুতি করেছিলেন, বিখ্যাত তন্ত্রসাধক গৌরী পণ্ডিত আরও এগিয়ে বলেছিলেন, ''বৈষ্ণবচরণ আপনাকে অবতার বলে! সে তো ছোট কথা বলে, আমার মতে যে শক্তির অংশ থেকে যুগে যুগে অবতার আসেন আপনিই সেই শক্তি।''

সেসময় ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত, যুক্তিবাদী যুবকবৃন্দ আস্থাহীন হয়েছিলেন আচারসর্বস্ব, অনড় ধর্মে। মননশীল ব্যক্তিমাত্রেই সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারবাদী নিরাকারের উপাসক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অনুরক্ত। মহামনা কেশবচন্দ্র সেন এঁদের একান্ত শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত। সেই কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এসে তাঁর প্রবল অনুরাগী হয়ে পড়লেন। কুসংস্কারপূর্ণ, আচারসর্বস্ব, অসংখ্য শাখাবিশিষ্ট হিন্দু ধর্ম যে এমন একজন উদার, সর্বধর্মসমন্বিত, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ঈশ্বরপ্রতিম মানুষকে উপহার দিতে পারে তা কেশব ভাবতে পারেননি।

শ্রীরামকৃষ্ণের অতুলনীয় চরিত্র ও তাঁর বিশ্বপ্রেমের প্রকাশ সনাতন হিন্দু ধর্মে মানুষের আস্থা ফেরানোর পক্ষে যথেষ্ট কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ক্রমে সেকালের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত হতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের ভাবের পরিবর্তন এতটাই যে, সুদূর পাশ্চাত্যে বসে মহাপণ্ডিত ম্যাক্সমুলার কেশবচন্দ্রের পরিবর্তন টের পান ও তার কারণ খুঁজতে গিয়ে তার পেছনে শ্রীরামকৃষ্ণকে আবিষ্কার করেন।

বস্তুত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে পরীক্ষিত যে-ভাবটি জগতকে দিয়ে গেছেন তা তিনটি কথায় প্রকাশ করা চলে। প্রথম, ঈশ্বরলাভই জীবনের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়, তা লাভের উপাদান তাঁকে লাভের আকাঙ্ক্ষা, যে-আকাঙ্ক্ষায় জগতের সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বিলীন হয়ে একমাত্র তাঁকে লাভের আকাঙ্ক্ষাতেই কেন্দ্রীভূত হবে। তৃতীয়, সব ধর্ম, মত বা পথই সেখানে পৌঁছে দিতে সক্ষম যদি তাঁকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা বজায় থাকে। আগামীতে নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হতে পারে, কিন্তু তাঁর আবিষ্কৃত এ-সিদ্ধান্তটি চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়। আর এটি শুধু যুক্তি দ্বারা উপনীত বৌদ্ধিক সিদ্ধান্ত নয়—জীবনে সাধনা দ্বারা অনুভূত। তাই আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম জগতে এর ব্যাপ্ত হয়ে পড়াই ভবিতব্য, এই দর্শনই স্বামীজীর 'বরিষ্ঠ' শব্দটি ব্যবহারের কারণ বলে মনে হয়।

আর একটি কারণ তাঁর অতুলনীয় মানবপ্রেম। যে-ব্রহ্মানন্দ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন ''যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ''—যে-আনন্দ পেলে তার চেয়ে অধিক কাম্য আর কিছু থাকতে পারে না, সেই আনন্দ উপভোগের আকর্ষণ শ্রীরামকৃষ্ণ অবলীলায় পরিত্যাগ করছেন। প্রার্থনা করছেন, ''মা, আমাকে বেহুঁশ করিস না। আমি এদের সঙ্গে কথা কব।'' দৈহিক, মানসিক তো দূরের কথা, এমনকী আধ্যাত্মিক সুখও তিনি চান না—এমনই তীব্র তাঁর লোককল্যাণস্পৃহা। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা অধিকতর আনন্দের উৎস যদি আবিষ্কার হয় এবং তাকে উপেক্ষা করে লোককল্যাণস্পৃহা যদি কখনও দেখা যায় তবেই এ-ভাবটি অতিক্রান্ত হয়েছে বলে ধরা যাবে, কিন্তু তা হওয়ার নয়। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণকে স্তুতি করেছেন,

''যস্য বীর্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥''

(৩ জুলাই ১৮৯৭ শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি)

—যাঁর শক্তিপ্রকাশে আমরা ও সমস্ত জগৎ কৃতার্থ সেই শিবরূপী স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে বন্দনা করি। এখানে 'স্বতন্ত্র' শব্দটিতে সেই বরিষ্ঠতার ইঙ্গিত। ঈশ্বর তো চিরস্বতন্ত্র, তাঁকে নতুন করে স্বতন্ত্র বলার অর্থ কী? ঈশ্বর অবশ্যই স্বতন্ত্র বা স্বাধীন, কিন্তু এতাবৎ সমস্ত অবতারই তাঁদের প্রচারিত ভাবের অধীন। ব্যতিক্রম কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি স্বাধীন কারণ তিনি ভাবমুখে থেকে জগতের সমস্ত ভাবেরই অধীশ্বর। তাঁর নিজের উপমায় তিনি সেই রঙের গামলা, যে-গামলা সমস্ত রঙের উৎস।

বস্তুত তাঁদের কথাগুলি আমাদের কাছে প্রায়শই শব্দমাত্র। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ যখন সিদ্ধপুরুষদের 'পিঁপড়ে' আখ্যা দিয়ে ব্রহ্মকে চিনির পাহাড়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, ''শুকদেব হদ্দ ডেঁও পিঁপড়ে, চিনির দু এক দানাই না হয় মুখে করুক,'' তখন শুকদেবের মতন আবাল্যত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সামনেও যে অনন্ত পরিসর বর্তমান তার আভাস আমরা পাই। ব্রহ্মভাবনা দূরের কথা, যখন স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরকোটি পার্ষদগণ থাকতেও তাঁর কর্মের গভীরতা বুঝতে সকলে অক্ষম দেখে বলে ওঠেন, ''বিবেকানন্দ কী করে গেল তা আর একটি বিবেকানন্দ থাকলে বুঝতে পারত'', তখন আমরা স্তব্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু এই কথাগুলি মনন করলে এ-বিষয়ে এক অসীমতার,

অনন্তের ভাব মনকে অধিকার করে যার পরিপ্রেক্ষিতে 'অবতারবরিষ্ঠ' শব্দটির অর্থের একটি ইঙ্গিত বা আভাস আসে। উপসংহার করব স্বামীজী ও শিষ্য শরচ্চন্দ্রের একটি কথোপকথন দিয়ে :

''শিষ্য—আচ্ছা মহাশয়, আপনি তাঁহাকে (শ্রীরামকৃষ্ণ) অবতার বলিয়া মানেন কি?

''স্বামীজী—তোর অবতার কথাটার মানেটা কি তা আগে বল?

''শিষ্য—কেন? যেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুষের ন্যায় পুরুষ।

''স্বামীজী—তুই যাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় বলে জানি—মানা তো ছোট কথা।...''

এই কথাটি যিনি বলছেন তিনি কোনও ভাবের আকুলতায় শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার বলে স্বীকার করেননি। পরন্তু তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ঈশ্বরীয় ভাবের অগণিত প্রকাশ দেখেও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালের প্রায় শেষদিন পর্যন্ত তাঁর অবতারত্ব অস্বীকার করে গেছেন। তারপর তাঁরই কৃপায় যখন নিজের বোধে তাঁর নরদেহের পেছনে অসীম অনন্তের উদ্ভাস উপলব্ধি করেছেন তখনই তাঁকে স্বীকার করেছেন। স্বামীজীর মুখের আর্ষ ঘোষণা : ঠাকুরের এভাব আগামী দেড় হাজার বছর চলবে। সে-তুলনায় শ্রীরামকৃষ্ণ মর্ত্যতনু ত্যাগ করেছেন প্রায় একশো বত্রিশ বছর আর স্বামীজী চলে গেছেন প্রায় একশো ষোলো বছর মাত্র। তাই তুলনামূলক যুগ পরিবর্তনের ক্রমাঙ্ক ধরে এখন এই অবতারের বরিষ্ঠতার যতটুকু প্রতীতি হচ্ছে, আগামী দিনের পরিবর্তনগুলি তাঁর বরিষ্ঠতার প্রকাশকে আরও উদ্ভাসিত করবে এ নিশ্চিত। ✠

ভগিনী নিবেদিতার সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

** বাগবাজারে দুটি বাড়ি * ভগিনী নিবেদিতার ঐতিহ্যপূর্ণ ভবনের সংরক্ষণ * আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডে নিবেদিতা : কিছু নতুন তথ্য * আত্মোৎসর্গের অন্য নাম নিবেদিতা* (প্রতি বইয়ের মূল্য : ৩৫ টাকা)